সফটওয়্যার সেবা রফতানিতে বিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন

মোস্তাফা জব্বার

এটি এখন সবারই জানা, বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতের বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস ২০১৮ সালের মধ্যে সফটওয়্যার ও সেবা খাতের রফতানি এক বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সংকল্প ঘোষণা করেছে। একই সাথে এক এক করে আরও অনেক খাতে ব্যাপক উন্নয়নের ওয়াদা করেছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হিসেবে বেসিসের এই স্বপ্নটাকে আমরা সবাই স্বাগত জানাই। বর্তমানে সফটওয়্যার ও সেবা খাতে সরকারিভাবে ১০০ মিলিয়ন ও বেসরকারিভাবে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের রফতানি হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। এমন একটি অঙ্ককে ১০ গুণ বা ৪ গুণ বাড়িয়ে দেয়াটা কঠিন চ্যালেঞ্জ তো বটেই। এর মাঝে আরও বড় প্রশ্ন হলো– গত বছরে রফতানি আয় খুব সামান্য বেড়েছে। এই হার শতকরা ১৫ ভাগের বেশি নয়। অন্যদিকে বেসিস গত ১৮ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে, বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের জন্য ২৬তম স্থানে রয়েছে। এর আগে আমরা ৩০তম স্থানে ছিলাম। পাঁচ বছরে মাত্র চার ধাপ এগিয়ে আমরা সেই স্বপ্নটাকে কি সফল করতে পারব?

স্বপ্নের তুলনায় অর্জন উল্লেখ করার মতো নয়। অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে ওয়ান বাংলাদেশ স্লোগান উদ্বোধন করে যে স্বপ্নটা পুরো জাতির সামনে তুলে ধরা হয়, সেটির প্রথম বছর যেভাবে গেছে এবং যে প্রবৃদ্ধি এই বছরে আমরা পেয়েছি, তাতে কোনোভাবেই এটি মনে করা যায় না, সেটি পূরণ হওয়ার মতো কিছু একটা। যেসব আনুষঙ্গিক উন্নয়ন হওয়ার কথা সেসব খাতেও তেমন কোনো অগ্রগতি চোখে পড়েনি। কিন্তু সেটি তো অসম্ভব কিছু নয়। ভাবতে হবে, সম্ভবের কাজটাও সফল হবে না কেন?

গত ১০ সেপ্টেম্বর সকালে এ বিষয় নিয়েই কথা বলতে এসেছিলেন ভারতীয় দুটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দুইজন পরামর্শক। এদের একজন হলেন এয়ন হিউইটের নেইল শাস্ত্রী এবং আরেকজন হলেন থলনসের রবার্তো কার্লোস এ ফ্লুরো। শাস্ত্রী ভারতীয়। ফলে বাংলাদেশ বিষয়ে তার জ্ঞান অনেক পাকা। ফ্লুরো পুরো আলোচনায় কথাও কম বলেছেন। সম্ভবত এখনও তাকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হচ্ছে। ওদেরকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন কমপিউটার কাউন্সিলের জাহাঙ্গীর নামে এক কর্মকর্তা। অনেকক্ষণ আলাপ করার ফাঁকে তারা জানালেন, একটি স্বল্পকালীন রোডম্যাপ তৈরির পরিকল্পনা আছে তাদের। বেসিস সভাপতিসহ অনেকের সাথেই এরা কথা বলেছেন। তাদের পরামর্শ যেরকম ছিল, তারচেয়ে আমার আলোচনাটি বিপরীত মেরুর এমন একটি মন্তব্য আমাকে বিস্মিত করেনি। আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার কথাগুলো শ্রুতিমধুর লাগবে না। এমনকি আমাদের শিল্প খাতের নেতারা আমার মতামতকে তেমন সহজভাবে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না। বরাবরই তারা উল্টো পথে চলে আসছেন। গত এক দশকে বেসিস তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারেনি– এটি তিক্ত হলেও সত্য।

আমার যে বক্তব্যটি কেউ সহজে গ্রহণ করতে পারে না, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে বিগত সময়গুলোতে সরকার ও ব্যবসায় সমিতিগুলো নীতি ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলতে পারেনি বলেই এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও আমরা আমাদের প্রত্যাশিত সফলতা পাইনি। এমনকি এখনও সফটওয়্যার রফতানি ও দেশীয় শিল্প খাত গড়ে তোলায় নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে কয়েকটি মোটা দাগের বিষয়ে কথা বলা যায়।

অভ্যন্তরীণ বাজার

সরকার ও বেসিস দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে চরমভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। দুই পক্ষেরই ধারণা– দুবাই, নিউইয়র্ক, লন্ডন, জার্মানি ঘুরলেই সফটওয়্যার রফতানি বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। এরা কোনোদিন হিসাব করে দেখে না যে রফতানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ একেবারে কম নয়। শুধু অর্থ খাতে বাংলাদেশ যে পরিমাণ সফটওয়্যার ও সেবা আমদানি করে, সেই পরিমাণ রফতানি কি আমরা করি? অথচ ইচ্ছা করলেই আমরা বিদেশ-নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারি। হতে পারে আমরা অপারেটিং সিস্টেম বা বড় ধরনের ডাটাবেজ সফটওয়্যার বানাতে পারব না, কিন্তু আমরা কি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার বা ইআরপিও বানাতে পারি না? দেশীয় সফটওয়্যার শিল্প খাত গড়ে তোলার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল, সেগুলো তো করা হচ্ছেই না, বরং যেসব পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ বাজার ও রফতানি দুই খাতেই সহায়ক হবে, সেসব কাজও আমরা গুছিয়ে করি না। কেমন করে বেসিস ও সরকারের এমন ধারণা হয়েছে– তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নিলেই দেশ সফটওয়্যার রফতানিতে বিপুল অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। সেজন্য কমডেক্স ফল থেকে সিবিট পর্যন্ত সব মেলাতেই আমাদের অংশগ্রহণ হয়েই চলেছে। দেশের ভেতরেও যেসব মেলার আয়োজন হয়, তাতে নানা পুরস্কার আর ঢাকঢোলে সময় যায়, কাজের কাজ তো কিছুই হয় না। বাজার তৈরির কোনো প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে না।

> বাংলাদেশে বিগত সময়গুলোতে সরকার ও ব্যবসায় সমিতিগুলো নীতি ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলতে পারেনি বলেই এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও আমরা আমাদের প্রত্যাশিত সফলতা পাইনি। এমনকি এখনও সফটওয়্যার রফতানি ও দেশীয় শিল্প খাত গড়ে তোলায় নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক নয়।

অন্যদিকে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ হলো, বেসিস বা সরকার কেউই অবকাঠামোর কথা মোটেই ভাবে না। সেই '৯৭ সালে বরাদ্দ দেয়া কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক এখনও চালু হয়নি। ওখানে ভবন আছে গরু-ছাগল বসবাস করার জন্য। ইদানীং শুনছি সেখানে ডাটা সেন্টার হচ্ছে। কিন্তু কবে যে ওখানে আইসিটির লোকজন বসে কাজ করা শুরু করবেন সেটি কেউ বলতেই পারেন না। ঢাকার জনতা টাওয়ার এখনও পরিত্যক্ত বাড়ি। কারওয়ান বাজারের ইনকুবেটর মূলত ভাড়ার বাড়ি। সেই যে কবে বড় বড় কোম্পানি সেখানে ঢুকেছিল আর বের হওয়ার কথা ভাবে না– নতুন উদ্যোক্তাদের প্রবেশ তো দূরের কথা। সেই অবস্থাটি বেসিসেরও। ওখানে সদস্য ও ভর্তি ফি বাড়িয়ে ছোট কোম্পানিগুলোর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এবার অর্ধেক প্রতিষ্ঠান ভোটার হতে পারেনি।

অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে তোলার জন্য সরকার ও ট্রেড বডির গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল মেধাসম্পদের ওপর। কিন্তু বেসিস ১৭ বছরে একবারও মেধাসম্পদ নিয়ে কোনো কথা বলেনি। বরং উৎসাহিত করেছে মেধাসম্পদ লঙ্ঘনকারীকে। একই সাথে বেসিস বাণিজ্যিক সফটওয়্যারকেও উৎসাহিত করেনি। সরকারের একটি মহলের সাথে হাত মিলিয়ে তারাও এখন ফ্রি সফটওয়্যারের রাজ্যে বিচরণ করছে। আমি এটি বুঝি না যে শুধু ফ্রি সফটওয়্যার বা সেবায় একটি শিল্প খাত কেমন করে গড়ে উঠবে। আমরা ভাবছি সবাই ফেসবুক বা গুগল হবে। কেউ মাইক্রোসফট বা অ্যাপল হবে– এমন ধারণাটি কারও কাজ করে না। বেসিস তো এসব বিষয়ে পুরোই নীরব। মেধাসম্পদ আইন নিয়ে কথা হয় না। কেউ কথা বলে না মেধাসম্পদ আইনের প্রয়োগ নিয়ে। কাজ করার পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। বছরের পর বছর ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের কোনো সভা হয় না। আইসিটি নীতিমালা নবায়ন হওয়ার কথা ২০১১ সালে। সেটির দিকে কেউ তাকায়ও না। যেসব কাজ করা হয়েছে, তার প্রায় সবই আদা-খেচড়া টাইপের। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দিলেও ডিজিটাল সরকার গঠনে বড় কোনো কাজ করেনি। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কাজে নেই কোনো সমন্বয়।

সব কিছুর উর্ধ্বে যে কথাটি, তা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন। শেখ হাসিনা যখন প্রথমবার সরকার গঠন করেন, তখন

(বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়)

ডিজাইনেরা ও ভবনে থাকা লোকজন একইভাবে দেখতে পারবেন কীভাবে অবকাঠামোটি ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ কখন কোথায় জড় হচ্ছে। ভবনে কী ও কোনো পরিবর্তন আনছে। মানুষ ভবনের কোথায় কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করছে, কীভাবে কী কাজ করছে। তবে মিডিয়া ল্যাবের গবেষকেরা বাণিজ্যিক চিন্তা মাথায় রেখে ডোপেলল্যাব তৈরি করেননি। এরা তা করেছেন আরও বড় ধরনের ও আরও বেশি কৌতূহল মেটাতে– 'প্রেজেন্সের' মৌলিক অর্থের ওপর ইউবিকুইটাস কমপিউটিংয়ের প্রভাব উদঘাটন করতে।

ইন্দ্রিয়গুলোর আরও ক্ষমতায়ন

এটি নিশ্চিত বলা যায়, কমপিউটিংয়ের পরবর্তী উত্তাল তরঙ্গে পরিধানযোগ্য ডিভাইসগুলো প্রাধান্য বিস্তার করবে। গবেষকেরা এই বিষয়টিকে দেখছেন সেন্সর ডাটার সাথে আরও অনেক বেশি সহজে ইন্টারেক্ট করার একটি সুযোগ হিসেবে। কার্যত পরিধানযোগ্য কমপিউটার হয়ে উঠতে পারে সেন্সরি প্রসথেসিস, অর্থাৎ সেন্সরসমৃদ্ধ একটি প্রত্যঙ্গ বা দেহাংশ। গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন সহায়ক ডিভাইস হিসেবে শরীরে ওয়ারেবল সেন্সর ও অ্যাকচ্যুয়েটর ব্যবহার নিয়ে। মানুষ সেন্সরি সাবস্টিটিউশন প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের বদলে সেন্সর থেকে সিগন্যাল ম্যাপিং করে আসছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, neu-responsibility– নতুন সতেজতা মানিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কের সক্ষমতা– আমাদের বিদ্যমান সেন্সরি চ্যানেল দিয়ে পাঠানো 'এক্সট্রা সেন্সরি' সতেজতা উপলব্ধির সুযোগ এনে দেবে। এরপরও সেন্সর নেটওয়ার্ক ডাটা ও মানুষের সেন্সরি অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে।

গবেষকদের বিশ্বাস, সেন্সরি প্রসথেসিসের সম্ভাবনা উদঘাটন করার একটি চাবিকাঠি হবে পরিধানকারীর তা অর্জনে মনোযোগী হওয়া। আজকের দিনের হাইয়েস্ট-টেক ওয়ারেবলগুলো, যেমন– গুগল গ্লাস আমাদের কাঁধের ওপর একটি তৃতীয় পক্ষের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে চায়, যা পরিধানকারীকে সংশ্লিষ্ট কনটেক্স্চ্যুয়াল ইনফরমেশন সাজেস্ট করে। এই সাজেশন্স আসে অজানা উৎপত্তিস্থল থেকে। কখনও তা আসে সমস্যাকরভাবে, এমনকি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা গবেষকদের সেন্সরি নেটওয়ার্কের বেলায় কখনও ঘটবে না। গবেষকদের সেন্সরি সিস্টেম আমাদের সুযোগ দেবে গতিশীলভাবে টিউন ইন ও টিউন আউট করার। গবেষকেরা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন এটুকু জানতে, পরিধানযোগ্য কমপিউটার মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত সক্ষমতায় পৌঁছতে পারে কি না। এমআইটি মিডিয়াল্যাবের গবেষকদের প্রথম পরীক্ষা নির্ধারণ করবে একটি ওয়ারেবল ডিভাইস কি তুলে আনতে পারবে, একটি অডিও সোর্সসেট থেকে কোন সোর্সটি শ্রোতা শুনছেন। গবেষকেরা চাইবেন এই ইনফরমেশন ব্যবহার করে ডিভাইস পরিধানকারীকে লাইভ মাইক্রোফোনে ও ট্রিডমার্শের হাইড্রোফোনে সরাসরি টিউন ইন করায় সক্ষম করে তুলতে, ঠিক যেমনিভাবে টিউন ইন করা হয় অন্যান্য স্বাভাবিক শব্দের উৎসের বেলায়। কল্পনা করুন, ঝর্ণাধারার কাছ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পানির নিচের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পারছেন গাছ-গাছালি, আর শুনতে পারছেন মাথার উপরের পল্লববিতানের পাখির কলকাকলি। এর ফলে সেন্সরি সিস্টেম ও নেটওয়ার্কড সেন্সর ডাটার সাথে ফ্লুইড কানেকশনের সূচনা ঘটবে। সম্ভবত তখন এমন একটি সময় আসবে, যখন সেন্সরি ও নিউরাল ইমপ্ল্যান্ট বা সংযোজন করেই এই কানেকশন গড়ে তোলা যাবে। গবেষকদের আশা, এসব ডিভাইস এবং এগুলো থেকে পাওয়া ইনফরমেশন আমাদের বিদ্যমান সেন্সরি সিস্টেমকে সরিয়ে দেয়ার বদলে বরং এর সাথে অঙ্গাঅঙ্গি করে থাকবে।

ইউবিকম্পের ভবিষ্যৎ

ইউবিকুইটাস শব্দের অর্থ 'একই সময়ে সবখানে হাজির থাকা– এক্সিস্টিং অর বিং এভরিহয়ার অ্যাট দ্য সেইম টাইম'। ইউবিকুইটাস কমপিউটিং হচ্ছে এমন একটি ধারণা, যেখানে টেকনোলজি সবসময় সবখানে থাকে, তবে কার্যত তথা ভার্চুয়ালি এর উপস্থিতিটা হবে আমাদের কাছে অদৃশ্য। এ ক্ষেত্রে কমপিউটার একটি আলাদা বস্তু না হয়ে, তা এমবেডেড থাকবে আমাদের এনভায়রনমেন্টে, বিল্টইন থাকবে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের বস্তুতে। ইউবিকম্পের ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় কমপিউটার হবে খুবই ছোট ও পরিব্যাপক। ফলে আমাদের প্রায় প্রতিটি বস্তুতে এমবেডেড থাকবে কমপিউটার। দেখা যাবে ঘরের মেঝে লাগানো রয়েছে কমপিউটার সেন্সর, যা মনিটর করবে আপনার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি। কমপিউটার থাকবে আপনার গাড়িতে, গাড়ি চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় আপনাকে সহায়তা দিতে। কমপিউটার তদারকি করবে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ, সবখানে সবসময়। ইউবিকুইটাস কমপিউটিংয়ের প্রমোটরেরা আশা করছেন, এনভায়রনমেন্টে ও প্রতিদিনের বস্তুতে কমপিউটেশন এমবেডেড করার ফলে মানুষ আজকের চেয়ে আরও ভালোভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারবে, ইনফরমেশন ও ইন্টারনেটের সাথে যখন-তখন আরও স্বাভাবিকভাবে ইন্টারেক্ট করতে পারবে। ইউবিকম্প সম্পর্কে আগ্রহীরা এমন পরিধানযোগ্য কমপিউটিংয়ের কল্পনা করছেন, যেখানে কমপিউটার সেন্সর বসানো থাকবে ঘড়িতে, হ্যাটে, বেল্টে, জুতায় ও এমনি সব ব্যবহার সামগ্রীতে। এমনকি মানবদেহেও। চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্যও। তবে ইউবিকুইটাস আপনাকে যেভাবে সবসময় নজরধারিতে রাখবে, এর ফলে প্রাইভেসি নিয়েও আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলবে কজ

সফটওয়্যার সেবা রফতানিতে

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

তিনি বছরে ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রগতি হচ্ছিল। কিন্তু মাঝখানে সাত বছরের বিএনপি-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে এই স্বপ্ন ধুলায় লুটিয়েছে। এরপরও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর একটি মাইলফলক কাজ করা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে– সরকার স্কুল-কলেজ স্তরে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

এখন ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু এই কাজটি চরম বিশৃঙ্খলভাবে করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সচেতনতা তৈরির জন্য শত শত কোটি টাকা খরচ করলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ তথাকথিত সচেতনতা কর্মসূচির চেয়ে অনেক জরুরি কাজ ছিল কমপিউটার ল্যাব গড়ে তোলা। দেশের প্রায় তিন কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক কমপিউটার শেখানোর কর্মসূচি হাতে নিয়ে এই পদে যদি শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া হয়, যদি কোনো প্রশিক্ষণ না দেয়া হয়, যদি কমপিউটার ল্যাব তৈরি করা না হয়, তবে সেই বিষয়টি কেমন করে ছাত্র-ছাত্রীরা আত্মস্থ করবে। আমি লক্ষ করেছি, এরই মাঝে এসব বিষয়ে গাইড বই বাজারে এসেছে। চলতি বছর এমন গুজব ছড়ানো হয়েছে যে এই বিষয়টি বাতিল করা হবে। ফলে বছরের শুরুতে এই বিষয়টি পড়েইনি। এখন বছরের শেষ প্রান্তে এসে ওদেরকে কোচিং করতে হচ্ছে। আমি জেনে খুব কষ্ট পেয়েছি, এমনকি শিক্ষকদেরকে ঘুষ দিয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বইপাঠ্য করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও কমপিউটার ল্যাব গড়ে তুলছে না। এমনকি ল্যাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আমি দেখেছি একটি স্কুলে পঞ্চম-দশম স্তরে ১১৫৪ ছাত্র-ছাত্রী আছে। ওদের জন্য কমপিউটার আছে পাঁচটি। এই অদ্ভুত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা কার কোন কাজে লাগবে, সেটি কাউকে বোঝানো যায়নি। পাঠক্রমের পশ্চাৎপদতার পাশাপাশি দিনে দিনে উচ্চশিক্ষায় এই বিষয় অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রেও কোনো সঠিক পরিকল্পনা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা দিনে দিনে এই বিষয় পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

বাংলাদেশের স্যাটেলাইট?

(৩৪ পৃষ্ঠার পর) না হওয়া এবং নিজস্ব অরবিটাল স্লট (নিরক্ষরেখা) বরাদ্দ না পাওয়ায় মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইটের যাত্রার সময় বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য এখনও চূড়ান্তভাবে অরবিটাল স্লট (নিরক্ষরেখা) বরাদ্দ পায়নি। অরবিটাল স্লট বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) বাংলাদেশকে নিরক্ষরেখার ১০২ ডিগ্রির পরিবর্তে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রিতে (পূর্ব) স্লট বরাদ্দ দিলেও অর্থের অভাবে বাংলাদেশ তা এখনও নিজের করতে পারেনি। অর্থের সংস্থান না হওয়ায় রাশিয়ার মহাকাশবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারস্পুটনিকের ৮৪ ও ১১৯ ডিগ্রিতে নিজস্ব দুটি স্লট থাকায় সংস্থাটির সাথে দুই মাসের একটি শর্তহীন চুক্তিও করে সরকার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্প শুরুর আগেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ এবং প্রকল্প গবেষণায় সরকারের ব্যয় হয়েছে ৮৬ কোটি টাকা। এ টাকা সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করেছে।

সূত্র আরও জানায়, সরকার দীর্ঘমেয়াদে ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি অবরিটাল স্লটটি ভাড়া নিতে যাচ্ছে। এতে সরকারের যে টাকা খরচ হবে, তা স্যাটেলাইট ভাড়া দিয়ে ৮ বছরে তুলে এনে এই প্রকল্পকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের কক্ষপথে বা অরবিটাল স্লট (৮৮-৯১ ডিগ্রি) এরই মধ্যে রাশিয়ার দুটি, জাপান ও মালয়েশিয়ার একটি করে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। অরবিটাল স্লটের ৮৮-৮৯ ডিগ্রি এখনও খালি থাকলেও আইটিইউ ওই জায়গা বাংলাদেশকে না দিয়ে বরাদ্দ দেয় ১০২ ডিগ্রিতে। কিন্তু প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশ তাতে বাধা দেয়। বিকল্প হিসেবে ৬৯ ডিগ্রিতে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তাব দেয়া হয় বাংলাদেশকে। কিন্তু বিকল্প প্রস্তাবেও আপত্তি তোলে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ও চীন কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com